সচিত্রকরণ : মাসুক হেলাল

fb.com/imran2592

AMARBOI.COM

রকিব হাসান

গোয়েন্দা কিশোর-মুসা-রবিন

সোনার মূর্তি

ঝোড়ো বাতাস ঝাপটা মারছে গাড়ির উইন্ডশিল্ডে, আছড়ে ফেলছে শরতের ঝরা পাতা। বারবার এদিক-ওদিক পিছলে যাওয়া গাড়ির চাকা সোজা রেখে চালাতে হিমশিম খাচ্ছে শখের গোয়েন্দা কিশোর পাশা।

'বাপরে, কী ঝড়!' পেছন থেকে বলল কিশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবিন মিলফোর্ড। পেছনের সিটে ওদের আরেক বন্ধু মুসা আমানের পাশে বসেছে।

কিশোরের বাড়ি বাংলাদেশে। একই সঙ্গে আমেরিকারও নাগরিক। বাবা-মা বেঁচে নেই। ছোটবেলায় মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন দুজনই। তার পর থেকে চাচা-চাচির কাছে মানুষ ও। চাচার নাম রাশেদ পাশা। আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে, হলিউডের কাছে সাগরপাড়ের এক ছোট্ট শহর রকি বিচে বাস করেন। বিয়ে করেছেন এক আমেরিকান মহিলাকে। তাঁর নাম মারিয়া পাশা। কিশোরের মেরিচাচি।

রবিন মিলফোর্ডের আসল বাড়ি আয়ারল্যান্ডে। আমেরিকার নাগরিকত্বও পেয়েছেন ওর বাবা। পেশায় সাংবাদিক। রকি বিচেই বাস।

মুসা আমান আমেরিকান নিগ্রো। ওর বাবা প্রথমে সিনেমার উঁচুমানের টেকনিশিয়ানের কাজ করতেন। বর্তমানে খামার ব্যবসা করেন।

কিশোরের পাশে প্যাসেঞ্জার সিটে বসা একজন সুন্দরী তরুণী, তার নাম জুলিয়া রবার্টসন। মেরিচাচির দূরসম্পর্কের এক বোনের মেয়ে। সেই সুবাদে কিশোরের কাজিন। কিশোর যে গাড়িটা চালাচ্ছে এখন, সেটা তারই।

জুলিয়াকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'জুলিয়া, সত্যি বলছ, তোমাদের পরিবারের কেউ কখনো সারা রাত উইন্ডিওকে থাকতে সাহস করেনি?'

'না।' অস্বস্তিভরা চোখে রাস্তার পাশের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে জবাব দিল জুলিয়া। ঝোড়ো বাতাসে ডালপালা আছড়াচ্ছে।

অনেক দিন থেকেই একটা রহস্য সমাধান করার জন্য কিশোরকে চাপাচাপি করছে জুলিয়া। এবার রকি বিচে কিশোরদের বাড়িতে বেড়াতে এসে, আর কিশোরের স্কুল ছুটি দেখে সুযোগটা কাজে লাগাতে ছাড়েনি ও। নিয়ে চলেছে সেই রহস্য সমাধানের জন্য।

©mmhs013

রকি বিচ থেকে বেশ কিছুটা দূরে উইন্ডি ওক নামে এক পাহাড়ি অঞ্চলে জুলিয়াদের একটা পুরোনো খামারবাড়ি আছে। এলাকার নামেই বাড়িটার নাম 'উইন্ডি ওক' রেখেছিলেন জুলিয়ার দাদা জর্জ এডিনবার্গ, যিনি এই খামারবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা।

'আমার দাদার মৃত্যুর পর ওখানে রাত কাটানো তো দূরের কথা, সন্ধ্যার পর কেউ থাকতেই সাহস করে না।' লম্বা চুলে হাত বোলাল জুলিয়া।

'ভয়টা কিসের?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

তেড়ছা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল জুলিয়া। যেন বুঝতে চাইছে, ওকে বিশ্বাস করা যায় কি না। তারপর বলল, 'বাড়িটাতে ভূতের উপদ্রব আছে। কুকুরের ভূত।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। চমকে উঠল মুসা। গল্পটা কিশোরের মোটামুটি জানা, তাই তার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল।

'তাহলে ওখানে যেতে চাও কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জীবনে একবারই ওই খামারটা দেখেছি আমি, অনেক ছোটবেলায়—এত ভালো লেগেছিল,' স্বপ্নিল শোনাল জুলিয়ার কণ্ঠ। 'আমি এখন আমার স্বামী ডেভিডকে নিয়ে ওখানে বাস করতে চাই। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই,' দৃঢ় কণ্ঠে যোগ করল ও, 'ওই ভুতুড়ে কুকুরের গুজবটা সত্যি কি না।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুসা। গাছগুলোতে বাড়ি মারছে ঝোড়ো বাতাস, ডালগুলোকে আছড়াচ্ছে চাবুকের মতো। এই পরিস্থিতিতে ভুতুড়ে খামারে যাওয়ার কথা ভেবে গায়ে কাঁটা দিল ওর।

'অ্যাই, কিশোর...' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ও।

প্রচণ্ড শব্দে একটা ওকগাছ ভেঙে গাড়ির ওপর পড়তে শুরু করল।

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি। অ্যাক্সিলারেটর পুরো চেপে ধরেছে কিশোর। গাড়ির কয়েক ইঞ্চি পেছনে ধড়াস করে রাস্তার ওপর আছড়ে পড়ল গাছটা। ব্রেক করে গাড়ি থামিয়ে, পেছনে ফিরে তাকাল ও। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর সঙ্গীদের মুখ।

'অল্পের জন্য বাঁচলাম!' কম্পিত কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল রবিন।

সবাই তাকিয়ে আছে বিশাল গাছটার দিকে।

'সাবধান করে দিল, বুঝলে!' খসখসে কণ্ঠে ফিসফিস করেই বলল জুলিয়া। ভীষণ ভয় পেয়েছে।

'ঝড়ে ভেঙেছে,' ওকে শান্ত করার জন্য বলল কিশোর।

কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না জুলিয়া। ভয়ে ভয়ে তাকাল রাস্তার পাশে দুলতে থাকা গাছের ডালগুলোর দিকে।

'কী কারণে পড়েছে, দেখা যাক,' কিশোর বলল।

নামল তিনজনে। জোরালো হাওয়ায় উড়ছে ওদের চুল।

গাছের কাছে আগে পৌঁছল রবিন। 'দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'গাছটাকে কেটে রাখা হয়েছিল!'

দেখার জন্য ছুটে এল সবাই।

ঝুঁকে ভালোমতো দেখে কিশোর বলল, 'হুঁ, ইচ্ছে করেই এমনভাবে কেটে রেখেছিল কেউ, যাতে সময়মতো আমাদের ওপর ধসে পড়ে,' গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল ও। 'এই যে দেখো, করাতের কাটা। নতুন।'

'মানুষে কাটেনি!' ভয়ে ভয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাল জুলিয়া। 'ভূতে কেটেছে! আর সামনে এগোনো উচিত হবে না আমাদের!'

'চলো, গাড়িতে চলো,' জুলিয়ার গলা জড়িয়ে ধরে ওকে অভয় দেওয়ার চেষ্টা করল কিশোর। বুঝতে পারল, জায়গাটার মোহ জুলিয়াকে এতদূর টেনে নিয়ে এলেও এখন ভূতের ভয় কাবু করে ফেলছে ওকে।

গাড়িতে উঠে হাত দিয়ে ডলে চুল সোজা করতে করতে কিশোর বলল, 'ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। ভারী গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে। সামনেই যেতে হবে আমাদের, উইন্ডি ওকের দিকে।' জুলিয়ার দিকে তাকাল ও। 'তা ছাড়া ভূত হোক বা না হোক, আমাকে জানতেই হবে, কেন বাড়িটায় যেতে বাধা দেওয়া হলো আমাদের।'

'আমরাও জানতে চাই!' সমস্বরে বলল রবিন ও মুসা।

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল জুলিয়া।

দুই

কাটা গাছটা থেকে কয়েক শ গজ এগিয়ে রাস্তার পাশে একটা জেনারেল স্টোর পাওয়া গেল। ওটা থেকে প্রায় মাইল খানেক এগোনোর পর উত্তেজিত কণ্ঠে মুসা বলল, 'ওই যে!'

ঘন ওকের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চোখে পড়ল পুরোনো একটা পাথরের তৈরি ফার্মহাউস। দোতলা বাড়িটার দুই পাশ থেকে উঠে গেছে দুটো চিমনি। বাড়িটার ধূসর পাথরের গায়ে সাদা অলংকরণ।

'ঠিক যেমন দেখে গিয়েছিলাম তেমনই আছে!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল জুলিয়া। 'পাশে এস্কিমোদের ইগলুর আকৃতিতে বানানো যে বাড়িটা দেখছ, ওটা আইস হাউস, আমার কাছে খুব ভুতুড়ে লাগে ওটাকে। বাঁয়ের পাহাড়টা আমার খুব প্রিয় খেলার জায়গা ছিল। আগেরবার যখন এসেছিলাম, ওই পাহাড়ের ঢালে উঠে নিচে গড়িয়ে পড়ে খেলতাম।' হাসল সে। 'বাড়িটার অন্য পাশে রয়েছে একটা সুন্দর লেক, এখান থেকে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না।'

'সত্যিই, এত সুন্দর, মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়,' বিড়বিড় করল কিশোর।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে বসল জুলিয়া। বাড়ির কাছে এগোচ্ছে গাড়ি। হঠাৎ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর। বাকিরাও তাকিয়ে আছে, সবাই হতাশ।

সবখানে আগাছা জন্মেছে। ভাঙা কব্জা থেকে কাত হয়ে ঝুলছে জানালার পাল্লা। রং চটে গেছে।

'ওখানে একটা গোলাঘর ছিল, সেটা কই!' আতঙ্কিত চিৎকার করে উঠল জুলিয়া। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুধু গোলাঘরের পোড়া ছাই। 'পুরো খামারটাতেই যেন শয়তানে আছর করেছে!' গলা ধরে এল জুলিয়ার। ধ্বংস আর অবহেলার ছাপ সবখানে।

'চলো, ভেতরে ঢুকে দেখি।' গাড়ি থেকে নামল কিশোর। যার যার মালপত্র বের করে নিল সবাই। ওদের নিয়ে বাড়িটার সদর দরজার দিকে এগোল কিশোর। বসার ঘরে ঢুকল ওরা। পায়ের চাপে মচমচ করে উঠল কাঠের তৈরি মেঝে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল রবিন। ওর চুল থেকে একটা ঝুলন্ত মাকড়সার জাল সরাল।

পুরো ঘরটায় চোখ বোলাল ওরা। আসবাবপত্রগুলো হলুদ প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢাকা। সবকিছুতে পুরু ধুলোর আস্তর। বাইরে গর্জন করে ফিরছে বাতাস। জানালার খোলা পাল্লাগুলো বারবার বাড়ি মারছে দেয়ালের গায়ে।

'নাহ্, এই ঘরটার অবস্থাও ভালো না,' রবিন বলল।

'জায়গাটা সত্যিই ভুতুড়ে,' বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল মুসা। ভূতের ভয়ে, না ঠান্ডায়, বোঝা গেল না।

'আমার কিন্তু ভালো লাগছে,' কিশোর বলল। 'সামান্য মেরামত করে নিলেই আর এখানে থাকতে অসুবিধে হবে না।'

'সামান্য?' নীরবে হাসল জুলিয়া।

কিশোরও হাসল। বান্ধবীকে হাসতে দেখে ভালো লাগছে তার। 'আর কিছু না হোক, বসবাসের উপযুক্ত করে ফেলতে পারব।'

আসার পথে জেনারেল স্টোর থেকে যেসব জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এসেছে ওরা, সেগুলো বের করল।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'তুমি ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাও।' নিজে হারিকেনে তেল ঢেলে আলো জ্বালল কিশোর। একটা হারিকেন মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'খাবার রেডি করো। আমি আর জুলিয়া আসবাবগুলোর ওপর থেকে চাদর সরাই।'

'আমার প্রিয় জায়গা: রান্নাঘর। দেখিয়ে দাও, ওখানেই আমার আনন্দ,' রসিকতার ঢঙে বলল মুসা। ওকে বাঁ দিকের একটা দরজা দেখাল জুলিয়া।

'ওই দরজাটার ওপাশে কী আছে?' আরেকটা দরজা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'লাইব্রেরি। আমার দাদা বই পড়তে খুব ভালোবাসতেন,' জুলিয়া বলল।

ঘন ঘন হাঁচি আর কঠোর পরিশ্রম করে কাজ সারার পর সবাই একমত হলো, হ্যাঁ, এখন বিষণ্ণতা অনেকখানি কেটেছে ঘরগুলোর।

'বাড়িটা এত আদিম, আমার খারাপই লাগছে,' ফায়ারপ্লেসের

AMARBOI.COM

©mmhs013

অল্পের জন্য বাঁচলাম

আগুনে রান্নাঘরের লাকড়ির চুলার কাছে বসে গা গরম করতে করতে বলল জুলিয়া। 'এখানে না আছে ইলেকট্রিক, না টেলিফোন। রান্নাঘরের চুলাটাও দেখো, লাকড়ির।'

'লাকড়ির চুলায় রান্না করতে কোনো অসুবিধে হয়নি আমার,' মুসা বলল। 'অনেক তো হলো—বসে বসে কি শুধু গল্পই করব, নাকি পেটটাকেও ঠান্ডা করতে হবে? আমার পেটের ভেতর ছুঁচো নাচছে।'

সবারই খিদে পেয়েছে। কিশোরের কথায় সেটা চাগিয়ে উঠল। বেশি ঝামেলায় যায়নি মুসা। খাঁটি বাংলাদেশি খাবার রান্না করেছে। খিচুড়ি আর ডিমভাজা। সঙ্গে টমেটোর সস। খিদে পেটে ওই পরিবেশে সাধারণ খাবারকেই মনে হলো অমৃত। সবার চেয়ে বেশি খেল মুসা। কিছুটা পেটুক স্বভাবেরই সে। ভীষণ খাবারের লোভ। আর সে-কারণে ওজনও বেশি, দেহটা গোলগাল।

খাওয়ার পর এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো ধুয়ে, গরম চায়ের পেয়ালা হাতে, আবার এসে ফায়ারপ্লেসের পাশে জাঁকিয়ে বসল সবাই।

'হ্যাঁ, জুলিয়া, এবার শুরু করো তোমার খামারবাড়ি আর কুকুরের ভূতের গল্প, গোড়া থেকে শুনি সবাই,' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল কিশোর। পরিচয়ের প্রথম দিকে জুলিয়াকে জুলিয়া আপু ডেকেছে ও, কিন্তু মানা করে দিয়েছে জুলিয়া। বলেছে, আপু-টাপু ডাকার দরকার নেই, শুনতে ভালো লাগে না, শুধু নাম ধরে ডাকলেই চলবে। ডেভিডকেও ডেভিড ভাই ডাকতে নিষেধ করে দিয়েছে ও।

বাইরের কালো হয়ে আসা সাঁঝের আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি ফুটল জুলিয়ার চোখে। ঘন ঘন কয়েকবার চুমুক দিল চায়ের কাপে, যেন সাহস সঞ্চয় করে নিল। তারপর শুরু করল, 'আমার দাদা জর্জ এডিনবার্গ বানিয়েছিলেন এই বাড়ি। তারপর আমার দাদিকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। এখানকার ওই পর্বতের সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছিল তাঁদের।' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। জায়গাটার প্রতি তারও যে প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে, বুঝিয়ে দিল। 'জমজমাট ছিল তখন এই বাড়ি। পশুপাখি পুষতে ভালোবাসতেন দুজনই। সবই ছিল এখানে। হাঁস-মুরগি কুকুর-বিড়াল ছাগল-গরু-ঘোড়া, সব। ফুল আর সবজির অনেক বড় বাগান করেছিলেন তাঁরা।' হাসল জুলিয়া। 'একবার নাকি বাগানের দরজা খোলা পেয়ে তাঁদের শখের বাগানের অর্ধেকটাই সাফ করে দিয়েছিল পোষা ছাগলের দল।'

হাসল কিশোর। রবিন আর মুসার মুখেও হাসি।

কিন্তু জুলিয়ার মুখে মেঘ জমল। 'কালো লাব্রাডর রিট্রিভার

AMARBOI.COM
©mmhs013

জাতের বিদেশি কুকুরও পুষেছেন তাঁরা। দুজনে মারা যাওয়ার বছর খানেক আগে একটা মাদি কুকুর চারটে বাচ্চা দিয়েছিল। বাচ্চাগুলোর সবই ছিল মদ্দা, আর অস্বাভাবিক বড়।'

'তারপর?' আগ্রহী হয়ে উঠেছে মুসা।

'বাচ্চাগুলো তাঁদের সারাক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল,' জুলিয়া বলল। 'উইন্ডি ওকে রাজত্ব করত ওরা। ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে খামারে ঢোকার সাধ্য ছিল না কারও।'

'তোমার দাদা-দাদির মৃত্যুর পর কুকুরগুলোর কী হলো?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'মনিবের শোকে এতটাই মন ভেঙে গেল কুকুরগুলোর, খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিল। খুব দুঃখজনকভাবে মরে গেল একটার পর একটা।' জুলিয়ার কণ্ঠের বিষণ্ণতা কিশোরদেরও স্পর্শ করল। 'দাদার খামার দেখাশোনার ভার ছিল যে লোকটার ওপর, তার নাম রাফায়েল বিঙ্গার। মরা কুকুরগুলোকে আইস হাউসের পেছনে কবর দিল ও।'

সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'ওই কুকুরগুলোই কি তাহলে উইন্ডি ওকের পরিবেশ ভুতুড়ে করে তুলেছে?'

'তাই তো ধারণা করা হয়,' মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া। লম্বা দম নিল। 'দাদার উইল পড়ার কয়েক মাস আগের ঘটনা এটা,' আবেগে ভরা জুলিয়ার কণ্ঠ। 'পরে দাদার উইল পড়ে তো মাথায় হাত দিয়ে বসল রাফায়েল বিঙ্গার। তাঁর শেষ ইচ্ছে তিনি লিখে গেছেন উইলে। কুকুরগুলোর কথাও লিখেছেন। ওগুলো মারা গেলে পাহাড়ের কাছের পারিবারিক গোরস্থানে দাদার পাশে ওগুলোকে কবর দিতে বলেছেন।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'ভুল জায়গায় তাহলে কবর দেওয়া হয়েছিল কুকুরগুলোকে?'

'হ্যাঁ।' কেঁদে ফেলল জুলিয়া। 'আর এ কারণেই আমাদের পেছনে লেগেছে ওগুলোর প্রেতাত্মা। যদিও উইলে আর যা যা লেখা আছে, সবই করা হয়েছে। কুকুরগুলোর নাম আলাদা আলাদাভাবে খোদাই করে পাথরের চারটে নামফলক লাগানো হয়েছে কবরের মাথার কাছে।'

'উইলটা পড়তে এত দেরি হলো কেন?'

'ওটা হারিয়ে গিয়েছিল, অনেক খুঁজে তারপর বের করা হয়েছে,' জুলিয়া বলল। 'আরও কিছু জিনিস এখনো নিখোঁজ রয়েছে। প্রতিটি কুকুরের আদলে একটি করে সোনার মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন দাদা। এক্কেকটা মূর্তি চার ইঞ্চি লম্বা। খাঁটি সোনায় তৈরি।'

'ওরিবাব্বা! তার মানে তো বিরাট দামি!' রবিন বলল।

মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া। 'তাই তো হওয়ার কথা। তবে কোথায় যে আছে জিনিসগুলো, সেটাই রহস্য।'

'এই বাড়িটাই একটা রহস্যের ডিপো!' মুসা বলল।

চিন্তিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ভূতগুলোকে প্রথম কে দেখেছে, আর কবে থেকে শুরু হয়েছে এই ভুতুড়ে কাণ্ড?'

'কুকুরগুলোকে যে রাতে কবর দিয়েছিল রাফায়েল বিঙ্গার সে-রাত থেকেই,' জুলিয়া বলল। 'বেঁচে থাকতে সারা দিন টানা ঘুম দিয়ে রাত নয়টায় জাগত কুকুরগুলো, বাড়ি পাহারা দেওয়া শুরু করত। ভূত হয়ে গিয়েও যেন সেই নিয়মই পালন করল কুকুরগুলো। রাত নয়টায় কুকুরের গোঙানি শুনতে পেল রাফায়েল বিঙ্গার। কবরগুলোর দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেল সে। গাছের ফাঁক দিয়ে চার জোড়া হলুদ চোখ দেখতে পেল। হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে তার দিকে ধেয়ে এল ওগুলো। রাফায়েল বিঙ্গার বলেছে সে ডাক নাকি ভয়ংকর। দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল ও। চোখের পলকে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলল কুকুরগুলো। দরজা-জানালার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে-খামচে সেগুলো ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে লাগল বেচারা রাফায়েল বিঙ্গার। একসময় পাহাড়ের দিকে চলে গেল কুকুরের চিৎকার। মরা মনিবের কবরের পাশে বসে বিলাপ করে কাঁদল সারাটা রাত। ভোরের দিকে ওদের কান্না থামল।

'ভয় তখনো কাটেনি রাফায়েল বিঙ্গারের। তবে সামান্য স্বস্তি পাচ্ছিল একটা কথা ভেবে—ভূতেরা শুধু রাতেই বেরোয় কবর থেকে। দিনের আলো ফুটলে আর বাইরে থাকতে পারে না। রাতে যত তাণ্ডবই করে বেড়াক না কেন, দিনের আলো ফোটার আগেই সুড়সুড় করে গিয়ে কবরে সেঁধোয়। এসব কথা জানা থাকা সত্ত্বেও ভয় দূর করতে পারল না রাফায়েল বিঙ্গার, রোদ ওঠার পর ঘর থেকে বেরোল। জানালা আর দরজার পাল্লায় অসংখ্য নখের আঁচড়ের দাগ দেখল। কিন্তু কুকুরের পায়ের একটা ছাপও নেই কোথাও। তার মানে পায়ে হেঁটে নয়, বাতাসে ভেসেই এসেছিল কুকুরগুলো, ভূতেরা যেভাবে আসে। সেদিনই ওই বাড়ি থেকে পালাল রাফায়েল বিঙ্গার। উইন্ডি ওকের ত্রিসীমানায় ঘেঁষল না আর। লেকের পাড়ে তার নিজের কেবিন আছে, ওখানে গিয়ে উঠল। দিনের বেলা কাজ করতে এলেও, সন্ধ্যার আগেই উইন্ডি ওকের কাছ থেকে সরে যেত। রাতে কোনো কারণেই বাড়িটার ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না আর।'

থেমে দম নিল জুলিয়া। তারপর বলল, 'রাফায়েল বিঙ্গারের ধারণা, ভুল জায়গায় কবর দেওয়াতেই এই উৎপাত করে কুকুরগুলো।'

শীতল শিহরণ বয়ে গেল মুসার মেরুদণ্ড বেয়ে। রবিন চুপ। কিশোর জানতে চাইল, 'তার কথা বিশ্বাস করেছিল তোমাদের পরিবারের লোকেরা?'

মাথা নাড়ল জুলিয়া। 'শুরুতে করেনি। আমার আব্বা ভূতে বিশ্বাস করে না। রাফায়েল বিঙ্গারের কিচ্ছা শুনে উইন্ডি ওকে রাত কাটাতে যায়। সারা রাত ভূতের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রকি বিচে চলে আসে। এরপর আর কোনো দিনই ও বাড়িতে যায়নি।'

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুলে গেল সামনের দরজা। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গেল ঘরের ভেতর দিয়ে। ফায়ারপ্লেসের নিভু নিভু হয়ে আসা আগুন অক্সিজেন পেয়ে লাফ দিয়ে উঠল। জুলিয়া চিৎকার করে উঠল। ভয় পেয়ে রবিনকে জাপটে ধরল মুসা।

ছুটে গিয়ে দরজা লাগিয়ে ছিটকানি তুলে দিল কিশোর। হাতঘড়ি দেখল সে। রাত নয়টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। বাইরে ঘন অন্ধকার।

ভূত আসার সময় হয়েছে। জড়সড় হয়ে গেল জুলিয়া আর মুসা। রবিনও চুপ।

'এসো, জোক বলি,' আড়ষ্ট পরিবেশ কাটানোর জন্য বলল কিশোর।

সবাই রাজি। হাসাহাসি করে অল্পক্ষণের মধ্যেই ভূতের কথা ভুলে গেল ওরা।

রবিনের একটা জোক শুনে হাসতে গিয়েও হঠাৎ ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে বসল জুলিয়া। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। ফিসফিস করে জুলিয়া বলল, 'শুনছ?'

এক মুহূর্ত পরই কলজে-কাঁপানো শব্দ কানে এল ওদের। বাড়ির এক পাশ থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ভেসে এল যন্ত্রণাকাতর গোঙানি।

'ভূত!' ফিসফিস করে বলল জুলিয়া।

বিলাপের মতো কান্না শোনা গেল। পরক্ষণে সেটা যেন বিস্ফোরিত হলো প্রচণ্ড চিৎকার আর গর্জনের শব্দে। মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ বয়ে গেল কিশোর ছাড়া বাকি তিনজনেরই। লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে ছুটল কিশোর। বরফের মতো জমে গেছে যেন অন্য তিনজন। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আইস হাউসটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। গাছের কালো ছায়ার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে চার জোড়া উজ্জ্বল হলুদ চোখ।

'ভুতুড়ে কুকুর!' পাশ থেকে শোনা গেল রবিনের কথা। মুসা আর জুলিয়াও এসে দাঁড়িয়েছে জানালার কাছে।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে ওরা। থরথর করে কাঁপছে জুলিয়া, টের পাচ্ছে সবাই। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে দেখছে ওরা, রাতের কালো অন্ধকারের পটভূমিতে আইস হাউসকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে হলুদ চোখগুলো। কোনো দেহ নেই, যেন অবয়বহীন চোখগুলোই শুধু বাতাসে নেচে বেড়াচ্ছে। তারপর, একসঙ্গে এগোতে শুরু করল ওগুলো। ক্রমেই বাড়তে লাগল ভয়ংকর চিৎকার আর গর্জনের শব্দ।

তিন

চেঁচিয়ে উঠে দুই হাতে চোখ ঢাকল মুসা।

বাকি তিনজনের পায়ে যেন শিকড় গজিয়ে গেছে।

হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল চোখগুলো। শব্দ থেমে গেল। ভুতুড়ে নীরবতা যেন গ্রাস করল ওদের। জানালায় গলা লম্বা করে দিয়ে অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করল।

©mmhs013

হঠাৎ জানালার কাচে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মস্ত একটা কালো ছায়া। জানালা আঁচড়াতে লাগল। আবার শুরু হলো তর্জন-গর্জন। চিৎকার করে উঠল জুলিয়া। বন্য আক্রমণে থরথর করে কাঁপছে জানালা। পিছিয়ে গেল চারজনই।

বাড়ি ঘিরে ফেলেছে কুকুরগুলো! প্রায় প্রতিটি জানালাতেই চোখ দেখা যাচ্ছে। রক্ত পানি করা গর্জন আর ভয়ংকর নখের আঁচড়ের শব্দে ভরে গেল বাতাস। ক্রমেই বাড়ছে সে শব্দ। বাড়তে বাড়তে একসময় অসহ্য হয়ে উঠল। ঘরের মাঝখানে সরে গেল আতঙ্কিত জুলিয়া ও মুসা। অন্ধকার ফুঁড়ে দিচ্ছে হলুদ চোখের আলো। দড়াম করে কী যেন আছড়ে পড়ল সামনের দরজার গায়ে। জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে খোলার চেষ্টা করতে লাগল। ভয়ংকর শব্দ সইতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

মনে হলো অনন্তকাল ধরে চলল সেই শব্দ। তারপর হঠাৎ করেই কমে এল। থেমে গেছে আক্রমণ। সরে যাচ্ছে কুকুরগুলো! মাথা তুলল মুসা। কথা বলার জন্য মুখ ফাঁক করতেই হাত তুলে ওকে চুপ থাকতে ইশারা করল কিশোর।

কান পেতে রয়েছে ওরা। চারটে ভুতুড়ে প্রাণীর ডাক শোনা গেল পাহাড় থেকে। কবরের কাছে বসে বিলাপ করছে।

ভয়ানক এক অগ্নিপরীক্ষা যেন। স্নায়ুর চাপ সইতে না পেরে ফোঁপাতে শুরু করল জুলিয়া। ধরে নিয়ে গিয়ে ওকে সোফায় বসিয়ে দিল কিশোর। চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল রবিন ও মুসা।

নিশ্চয় এই ভুতুড়ে কাণ্ডের কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা আছে, ভাবছে কিশোর। জানতেই হবে আমাকে, ভেবে, সামনের দরজার দিকে রওনা হলো ও।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল জুলিয়া, 'খবরদার, এখন বাইরে যেয়ো না!' এমন চেঁচামেচি শুরু করল ও, থেমে যেতে বাধ্য হলো কিশোর। মোলায়েম স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, পরেই যাব।'

কিশোরকে থেমে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন আর মুসাও।

'চলো তাহলে, ঘুমানো যাক,' কিশোর বলল।

'ঘুমানো যদি সম্ভব হয়,' কম্পিত কণ্ঠে বলল মুসা। দূরে বিলাপ করেই চলেছে কুকুরগুলো।

জুলিয়াকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে নিজেদের ঘরে চলে এল কিশোররা তিনজন। বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল মুসা ও রবিন, তাতে খুশিই হলো কিশোর। তবে সে নিজে ঘুমাতে পারল না। ভূতগুলোকে কাছে থেকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছে।

ভোররাতের দিকে থামল কুকুরের ডাক। কাউকে না জাগিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে এল কিশোর, ভোরের ঠান্ডা বাতাসে।

কুয়াশা পাক খাচ্ছে গাছপালার মধ্যে। গাছের ডালে চাবুকের মতো বাড়ি মারছে নাছোড় বাতাস। হঠাৎ ফিসফিসানি কানে এল কিশোরের।

'কে?' ডেকে জিজ্ঞেস করল ও। পরক্ষণে বোকা হয়ে গিয়ে বুঝতে পারল, ওটা বাতাসের শব্দ। আনমনেই হেসে উঠল ও। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ঘরের দরজা-জানালা পরীক্ষা করল ও। অনেক জায়গায় নখের আঁচড় দেখতে পেল। অনেক পুরোনো দাগও আছে।

গত রাতের আগেও এখানে এসেছিল কুকুরগুলো, জুলিয়া যে

কিশোরের ওপর চোখ পড়ল টেডের

বলেছে, তার প্রমাণ দেখতে পেল কিশোর।

তবে মাটিতে কোনো দাগ নেই। হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। পা দিয়ে আলগা পাতা সরিয়ে দিল।

মাটি আলগা হয়ে আছে জায়গাটার। খুঁড়ে আবার ভরাট করে দিলে যেমন হয়। কয়েক ফুট দূরে আরেকটা একই রকম মাটি ভরাট করা গর্ত দেখতে পেল কিশোর। তার কয়েক ফুট দূরে আরও একটা গর্ত। তারপর আরও, আরও। আইস হাউসের দিকে চলে গেছে সেগুলো।

সেগুলো দেখে দেখে এগিয়ে চলল কিশোর। আইস হাউসের পেছনে এসে থেমে গেল। ভোরের ম্লান আলোতে দেখল, পাশাপাশি বসানো চারটে খোদাই করা নামফলক।

চার

জোরে জোরে নামগুলো পড়ল কিশোর : KOOB, ESROH, ENINAC, NEDRAG। অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে নামগুলো মুখস্থ করে নিল কিশোর। এগুলোর ব্যাপারে জুলিয়ার সঙ্গে কথা বলবে।

আবার গর্তগুলোর দিকে মনোযোগ দিল কিশোর। ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। হাঁটার কোনো চিহ্ন নেই, পায়ের ছাপ নেই, অথচ চলার পথে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে গেছে ভূতগুলো। হঠাৎ গাছের

©mmhs013

ফাঁক দিয়ে দুজন লোককে কথা বলতে দেখে চমকে গেল ও। ঝট করে একটা গাছের আড়ালে সরে গেল।

তারপর সাবধানে পা টিপে টিপে গাছের আড়ালে আড়ালে এগোল। লোকগুলো কী বলছে শোনার জন্য যতটা সম্ভব কাছে চলে এল।

'বেশি করে কিনো, যাতে টান না পড়ে,' দুজনের মধ্যে বয়স্ক লোকটাকে রুক্ষ কণ্ঠে বলতে শুনল কিশোর। 'এই ছেলেগুলো এত সহজে যাবে বলে মনে হয় না আমার।'

কী জিনিস কিনতে বলল লোকটা? ওর বলার ভঙ্গি ভালো লাগল না কিশোরের। লোকটা লম্বা। পেশিবহুল শক্তিশালী দেহ। ধূসর হয়ে এসেছে লাল চুল। নিষ্ঠুর চেহারা। কালো চোখের তারা অস্থির।

তার সঙ্গীকে উদ্বিগ্ন মনে হলো। হাই তুলল বড় করে। তাতে রেগে গেল লম্বা লোকটা। গর্জন করে বলল, 'আমার কথা তোমার কানেই ঢুকছে না মনে হয়? যাও, তাড়াতাড়ি যাও। ওর সঙ্গে যদি দেখা করতে না পারো, ভালো হবে না বলে দিলাম।'

দ্বিতীয় লোকটা লম্বা লোকটার চেয়ে সামান্য খাটো, বয়সেও কম, তবে এই লোকটাও বেশ স্বাস্থ্যবান আর পেশিবহুল। লম্বা লোকটার মতো চেহারা এতটা রুক্ষ না হলেও চেহারার মিল রয়েছে। ভাই হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই, ভাবল কিশোর।

কিন্তু ওরা কে? ভাবতে ভাবতে পায়ের ওপর ভার বদল করতে গেল কিশোর। পায়ের নিচে একটা শুকনো ডাল চাপা পড়ে ছিল। মট করে ভাঙল সেটা।

চমকে গেল লোকগুলো। চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

আড়াল থেকে ছুটে বেরোল কিশোর, লোকগুলো কোথায় গেছে বোঝার চেষ্টা করল। উধাও হয়ে গেছে লোকগুলো।

ভাবতে লাগল কিশোর। অল্প বয়সী লোকটাকে কিছু কেনার নির্দেশ দিয়েছে লম্বা লোকটা, যেগুলো প্রচুর ব্যবহার হয়। তা ছাড়া কোনো একজন মানুষের সঙ্গেও দেখা করতে বলেছে দ্বিতীয় লোকটাকে, বলেছে, 'ওর সঙ্গে যদি দেখা করতে না পারো ভালো হবে না বলে দিলাম।' কিশোরের মনে হলো, জিনিসগুলো কী, আর কোন লোকের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে, জানতে পারলে হয়তো অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।

আপাতত আর কিছু করার নেই এখানে। বাড়ি ফিরে চলল কিশোর। অদ্ভুত ইগলু-আকৃতির আইস হাউসটার পাশ দিয়ে এগোনোর সময় কৌতূহলী হয়ে ভেতরে ঢুকল ও। হঠাৎ জোরে পেছন থেকে ধাক্কা মারল ওকে কেউ। চিৎকার দিয়ে ভেতরে পড়ে গেল কিশোর। হারিয়ে গেল কালো গর্তের মধ্যে।

ইতিমধ্যে, বাড়ির ভেতরে, কিশোরকে না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ওর বন্ধুরা।

'গেল কোথায় ও?' ককিয়ে উঠল জুলিয়া। 'অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে যায়নি তো!'

রবিন বলল, 'নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।'

'তোমাদের এই বিপদের মধ্যে নিয়ে আসাই উচিত হয়নি আমার,' জুলিয়া বলল।

'আমার মনে হয়, ওকে খুঁজতে বেরোনো দরকার,' মুসা বলল। গত রাতের ভয়ংকর ঘটনাটা এখনো জ্বলজ্বল করছে ওর মনে।

বেরোনোর ব্যাপারে একমত হলো রবিন। 'কিন্তু মনে রাখতে হবে, দিনের বেলায়ও আমরা নিরাপদ নই। দিনের আলোতেই গাছটা ঠেলে ফেলা হয়েছিল। কিশোর হয়তো কঠিন কোনো বিপদে পড়েছে।'

বাইরে বেরিয়ে এল তিনজনে। মাটিতে চোখ বুলিয়ে দেখল, পায়ের ছাপ বা অন্য কোনো চিহ্ন আছে কি না। ধূসর সকালের কনকনে ঠান্ডা গায়ে কাঁপুনি তুলল ওদের।

উৎকণ্ঠিত হয়ে পাহাড়ের দিকে এগোল ওরা। ওপরটা শূন্য। শুধু একটা বড় পাথরের চাঙড় পড়ে আছে। কিশোরকে পাওয়া গেল না এখানে। লেকের কিনার ধরে এগোল ওরা।

'দেখো! পায়ের ছাপ!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'কিশোরের জুতোর!'

তিনজন তিনদিকে আলাদা হয়ে গিয়ে জোরে জোরে কিশোরের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল।

'...আমি আইস হাউসে,' মনে হলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল জবাবটা। কিশোরের কণ্ঠ।

আইস হাউসের কাছে ছুটে এল ওরা। খোলা জায়গাটা দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল মুসা, 'কিশোর?'

'আমাকে এখান থেকে বের করো,' নিচ থেকে শোনা গেল কিশোরের কথা। 'আমি নিচে পড়ে আছি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, দড়ি আর টর্চ আনতে ছুটল জুলিয়া ও মুসা। ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

গর্তের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল কিশোর, যাতে ছুড়ে দেওয়া টর্চটা ওর মাথায় না লাগে।

প্লাস্টিকের শক-প্রুফ টর্চ, মাটিতে পড়েও কিছুই হলো না। তুলে নিয়ে আশপাশটা পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। পাথরে তৈরি গর্তটার দেয়াল। এটা বানানো হয়েছিল বরফ রাখার জন্য। তাতে রাখা হতো মাছ-মাংস এসব পচনশীল জিনিস। এক ধরনের আদিম রেফ্রিজারেটর এটা। পুরু হয়ে পাতায় ঢেকে রয়েছে গর্তের মেঝে। এই পাতার গদির জন্যই নিচে পড়েও ব্যথা পায়নি ও।

পাতা সরিয়ে নিচে কী আছে দেখতে গিয়ে অবাক হলো। মেঝের বেশির ভাগ পাথরই তুলে ফেলা হয়েছে। গভীর করে খোঁড়া হয়েছে নিচের মাটি। দেয়ালের দিকে তাকাল। সেখানেও বহু জায়গার পাথর নেই। সরিয়ে ফেলে মাটি খোঁড়া হয়েছে।

অবশেষে একটা দড়ি নেমে এল ওর দিকে। দড়ির মাথা কোমরে বেঁধে দুই হাতে চেপে ধরল কিশোর। ওপরে টেনে তোলা হলো ওকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও, 'আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম—আমাকে হয়তো আর কোনো দিন খুঁজে পাবে না তোমরা।'

'কথা বাদ,' থামিয়ে দিল ওকে রবিন। 'আগে ঘরে চলো। রেস্ট নাও, তারপর শুনব।'

পাঁচ

শীতে কাঁপতে থাকা কিশোরকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল ওরা। ফায়ারপ্লেসের দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের সামনে বসিয়ে দেওয়া হলো ওকে। খাবার এনে দেওয়া হলো। খাবার আর বিশ্রাম নিয়ে কিছুটা সুস্থির হওয়ার পর, কী ঘটেছিল, বিস্তারিত জানাল কিশোর। ওকে উদ্ধার করে আনার জন্য ধন্যবাদ দিল সবাইকে।

শুনে শিউরে উঠল জুলিয়া। 'মারাও যেতে পারতে তুমি! ইস্, কোন কুক্ষণেই যে তোমাকে নিয়ে রওনা হয়েছিলাম...'

বাধা দিয়ে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, তোমার কি ধারণা ওই লোকগুলোই তোমাকে ঠেলে ফেলেছে? যে লোকটা গাছ কেটে আমাদের ওপর ফেলতে চেয়েছিল, হয়তো ওই লোকটাই গর্তে ঠেলে ফেলেছে তোমাকে। কিংবা আজ যে দুজনকে দেখেছ, ওদের কেউ।'

'আমার মনে হয় না,' জুলিয়া বলল। 'চেহারার বর্ণনা শুনে বুঝতে পারছি, ওরা টেড আর টেনি, রাফায়েল বিঙ্গারের ছেলে। আমাদের পরিবার ওদের খুবই বিশ্বাস করে। কাছাকাছিই থাকে ওরা, একটা কেবিন আছে রাফায়েল বিঙ্গারের। এ তথ্যগুলো আগেই তোমাদের জানানো উচিত ছিল আমার। লম্বা লোকটার নাম টেড। একেবারে ছোটবেলায়, হাফপ্যান্ট পরে এই খামারে কাজ করতে এসেছিল। তার অনেক পরে এসেছিল টেডের ছোট ভাই টেনি। বাপের কাজে সহায়তা করত ওরা। রাফায়েল বিঙ্গার মারা যাওয়ার পরও ওরা রয়ে গেছে, বিশ্বাসী হওয়ায় বাবা ওদের চাকরিতে রেখে দিয়েছে। এই খামারের দেখাশোনার ভার এখন তাদের ওপর।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে জুলিয়ার কথা শুনছে কিশোর। অবাস্তব ভুতুড়ে কুকুরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু বাস্তব মানুষকে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। আপাতত টেড আর টেনিকে সন্দেহের তালিকায় রাখল কিশোর। তবে সেটা জুলিয়াকে জানাল না।

'জায়গাটা ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে,' জুলিয়া বলল। 'রাতে ভূতের অত্যাচার, দিনে মানুষের। আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। প্রথমে জেনারেল স্টোরে হেঁটে যাব আমরা। তারপর ডেভিডকে ফোন করে আসতে নিষেধ করব। টেড-টেনিকে বলব যাতে রাস্তার ওপর পড়ে থাকা গাছটা সরিয়ে ফেলে।' কিশোরের দিকে তাকাল ও। 'ফিরে এসে তোমার গাড়িটা নিয়ে, এই খামার আর ভূতের দলকে চিরবিদায় জানিয়ে রকি বিচে ফিরে যাব।' ওর

AMARBOI.COM
©mmhs013

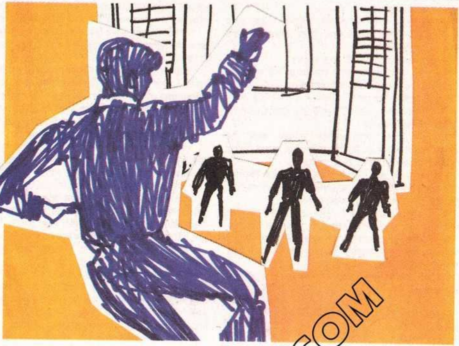

মনে হচ্ছে কেউ কিছু খুঁজেছে এখানে

কণ্ঠের হতাশা চাপা রইল না কারও কাছে।

কিশোর বলল, 'রকি বিচে তো অবশ্যই ফিরব, তবে রহস্যটার সমাধান করে, তার পর।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল ও। 'তোমরা কী বলো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রবিন ও মুসা।

জুলিয়ার দিকে ফিরল আবার কিশোর। 'ডেভিডকে আসতে নিষেধ করার কোনো দরকার নেই। আসুক ও। ওকে নিয়েই রহস্যের সমাধান করব।'

কয়েকটা সেকেন্ড দ্বিধা করল জুলিয়া। তারপর বিষণ্ণ হাসি ফুটল মুখে। নীরবে মাথা ঝাঁকাল।

'আমি বুঝতে পারছি, ভূতের ভয় দেখিয়ে এখান থেকে কেউ তাড়াতে চাইছে আমাদের,' কিশোর বলল। তারপর ছুড়ে দিল প্রশ্নটা, 'এখন বলো দেখি, আইস হাউসের দেয়াল আর মেঝের মাটি কে খুঁড়ল?'

জবাব দিতে পারল না কেউ।

জুলিয়া বলল, 'টেড কিংবা টেনির সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করব।'

'আগে বরং ওদের গাছটা সরাতে বলো, ডেভিড যাতে গাড়ি নিয়েই আসতে পারে।' একটা কাগজে খসখস করে কিছু লিখল কিশোর। 'আমাদের ভূতগুলোর নাম কী, জানো?'

কিশোরের লেখা কাগজটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাকি তিনজন। জুলিয়া জিজ্ঞেস করল, 'এই নাম তুমি জানলে কী করে? এগুলো তো দাদার কুকুরগুলোর নাম।'

'কুকুরগুলোই তো এখন ভূত হয়ে গেছে। কুকুরের কবরের মাথার কাছে বসানো ফলকগুলো আমি দেখেছি।'

'কুকুরগুলোর নাম পাথরের ফলকে লিখে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উইলে,' জুলিয়া বলল। 'দাদা যে নামে ডাকত।'

'কিন্তু নামগুলোকে ইনডিয়ানদের দেবদেবীর নামের মতো মনে হচ্ছে,' রবিন বলল। 'পোষা কুকুরের এমন নাম কেউ রাখে না।'

নামগুলো অস্বাভাবিক, একমত হলো চারজনই।

'চলো, আমরাও দেখে আসি,' রবিন বলল।

'চলো,' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

কুকুরের কবর দেখার পর পাহাড়ের দিকে রওনা হলো ওরা। কবরস্থানের বেড়া ভেঙে গেছে সেই কবেই। জুলিয়ার দাদা-দাদির কবরে কোনো ফলক নেই, হয়তো খুব সাধারণ বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছিল কবর ঘিরে, সেগুলোর কোনো চিহ্নই নেই আর এখন।

'অদ্ভুত তো!' মুসা বলল। 'কুকুরের কবরকে এত প্রাধান্য দেওয়া হলো, অথচ মানুষের কবরের প্রতি কোনো খেয়াল নেই।'

'ইচ্ছে করেই করেছে,' কিশোর বলল। 'কুকুরের কবরে কবরফলক লাগিয়ে এটাই বোঝাতে চেয়েছে, ফলকগুলোতেই

AMARBOI.COM

©mmhs013

রয়েছে রহস্য সমাধানের সূত্র।'

আপাতত, আর কিছু দেখার নেই এখানে। পাহাড় বেয়ে নামার পথে মাটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'কেউ এখানে খোঁড়াখুঁড়ি করেছিল!'

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। 'কী করে বুঝলে?'

'দেখছ না, মাটি কেমন আলগা হয়ে আছে, গর্ত করার পর তাড়াহুড়া করে আবার বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

রবিনের নির্দেশিত জায়গাটা ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। 'ঠিকই বলেছ। মনে হচ্ছে কেউ কিছু খুঁজেছে এখানে।'

'কী?' জুলিয়ার জিজ্ঞাসা।

'আরেকটা রহস্য,' শূন্যের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল কিশোর। 'আইস হাউসে যে উদ্দেশ্যে মাটি খোঁড়া হয়েছে, হয়তো সেই একই উদ্দেশ্যে এখানেও খোঁড়া হয়েছে।'

বাড়ি ফিরে এল ওরা। নখের আঁচড়গুলো দেখাল কিশোর। ভূতের ভয়ে কেঁপে উঠল জুলিয়া আর মুসা। পায়েচলা পথের পাশে সারি দিয়ে খোঁড়া জায়গাগুলোও দেখাল কিশোর।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল জুলিয়া। 'সমাধান তো কিছু হচ্ছেই না, রহস্য আরও জটিল হচ্ছে।'

'তাতে কী?' হাসল রবিন। 'সূত্র খুঁজে বের করব আমরা। তারপর সেগুলো থেকে রহস্যের সমাধান। কিশোর যখন আছে, চিন্তা নেই, রহস্যের সমাধান হবেই।'

কিন্তু ওর কথা কিশোরের কানে গেল কি না বোঝা গেল না। গভীর ভাবনায় ডুবে আছে ও।

ছয়

দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার পর মুসা জিজ্ঞেস করল, 'জুলিয়া, হারানো সোনার মূর্তিগুলোর কথা আর কী জানো?'

'আমার বাবার বিশ্বাস, এখনো উইন্ডি ওকেরই কোথাও রয়েছে ওগুলো। আর সে কারণেই খামারে থাকতে এসেছিল বাবা। ভূত দেখে বাবা চলে যাওয়ার পর আমাদের পরিবারের আর কেউ খুঁজতে আসেনি।'

কী যেন চিন্তা করতে করতে হঠাৎ প্রশ্ন করল কিশোর, 'তোমার দাদা-দাদির কী কী শখ ছিল?'

এক মুহূর্ত ভাবল জুলিয়া। বলল, 'বাগান করা, কুকুর ও ঘোড়া পোষা। তবে সবচেয়ে ভালোবাসতেন বই পড়তে।' কিশোরদের লাইব্রেরিতে নিয়ে এল সে। বড় ঘরটার পুরো দেয়ালের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত তাক। প্রতিটি তাক বইয়ে ঠাসা। তাকের গায়ে লেবেল লাগিয়ে বোঝানো হয়েছে কোনটাতে কী ধরনের বই আছে।

'কুকুর, ঘোড়া, বই,' লেবেলগুলো পড়তে লাগল মুসা।

'আসলে কী জানতে চাও বলো তো?' হঠাৎ কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

রহস্যময় হাসি হাসল কিশোর। চোখেও মিটিমিটি হাসি। 'আমার ধারণা, এই খামারবাড়িতেই কোথাও লুকানো রয়েছে সোনার মূর্তিগুলো।'

আবার ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের সামনে এসে বসল ওরা। কিশোর বলল, 'জুলিয়া, সোনার মূর্তিগুলো তৈরি করার পর সযত্নে সেগুলো লুকিয়ে ফেলেছিলেন তোমার দাদা। তোমাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। উইলে নির্দেশ দিয়ে গেছেন কোথায় আছে মূর্তিগুলো?'

'কোথায়?' অধৈর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রবিন। জুলিয়া আর মুসাও অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

'আমার ধারণা, কুকুরগুলোর নামের মধ্যেই রয়েছে সেই সূত্র,' আবারও রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ওগুলোর নামে কোথাও একটা গোলমাল রয়েছে। সেই গোলমালটা স্বাভাবিক করতে পারলেই মূর্তিগুলো কোথায় লুকানো আছে বুঝতে পারব...'

হঠাৎ জোরে একটা শব্দ হলো জানালার পাশে। দৌড়ে গেল কিশোর। ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা। চৌকাঠে পড়ে থাকা শুকনো পাতা গড়িয়ে গেল। হাত দিয়ে সেগুলো সরিয়ে ফেলে, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল বাইরে। কেউ নেই!

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে কি ওদের কথা শুনছিল কেউ? টেড, না টেনি?

ফিরে এসে আবার কুকুর নিয়ে আলোচনা শুরু করল ও। লাইব্রেরি থেকে একটা ডিকশনারি নিয়ে এল মুসা। কিছুক্ষণ সেটা ঘাঁটল ওরা। অদ্ভুত শব্দগুলোর মানে বের করার চেষ্টা করল।

'আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারে একমাত্র ওই ভূতগুলো,' হেসে বলল রবিন। 'বলতে পারে বেঁচে থাকতে ওদের আসল নাম কী ছিল।'

'হয়তো সেই চেষ্টাই করছে!' সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'এমনও তো হতে পারে, মনিবের মায়া কাটাতে পারছে না—রাফায়েল বিঙ্গারের এই কথাটা ভুল। হয়তো নিজেদের মূর্তিগুলোর জন্যই বাড়িটাতে আছর করে রেখেছে কুকুরের ভূতগুলো। ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে আমাদের বোঝাতে চাইছে, বাড়ির ভেতরই রয়েছে মূর্তিগুলো।'

'দেখো, কিশোর, প্লিজ, কোনো ঝুঁকি নিতে যেয়ো না,' ককিয়ে উঠল জুলিয়া। ওর এখনো ধারণা, ভূতগুলো খুব পাজি।

'ততক্ষণে ডেভিডও চলে আসতে পারে,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'ও আমাদের সহযোগিতা করতে পারবে।'

'রাত নয়টার সামান্য আগে রবিন আর আমি বেরিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকব,' কিশোর বলল। 'এ বাড়ির দিকে এগোনোর সময় ভূতগুলোর ওপর নজর রাখব। নিশ্চয় কিছু দেখতে পাবই, যা আমাদের রহস্য সমাধানে সাহায্য করবে।'

'আমাকে বাছাই করার জন্য ধন্যবাদ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন।

হঠাৎ দরজায় থাবা পড়তে চমকে উঠল জুলিয়া। ভাবল, ডেভিড এসেছে। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। মৃদু আলোয় আবছাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল একজন লোককে। চিনতে পারল কিশোর। রাফায়েল বিঙ্গারের বড় ছেলে টেড বিঙ্গার। নিচুস্বরে জুলিয়ার সঙ্গে কথা বলে তাড়াহুড়া করে চলে গেল।

'ডেভিডের আসতে দেরি হবে,' ফিরে এসে হতাশ ভঙ্গিতে কিশোরদের জানাল জুলিয়া। 'এইমাত্র জেনারেল স্টোর থেকে এসেছে টেড। ওখানেই আছে ডেভিড। তবে ওর গাড়ির অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে। আমাদের জানাতে বলে দিয়েছে টেডকে, রাত হওয়ার আগেই এখানে আসার চেষ্টা করবে ও।'

'তাহলে আর কী,' জুলিয়াকে উৎসাহ দিল কিশোর। 'চিন্তা কোরো না।'

'এসব খোঁড়াখুঁড়ির ব্যাপারে টেডকে জিজ্ঞেস করেছিলে কিছু?' রবিন জানতে চাইল।

'নাহ্, ও কিছু জানে না,' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে জবাব দিল জুলিয়া। 'ও বলেছে, এ ধরনের ভুতুড়ে বাড়িতে থাকলে উল্টোপাল্টা কত কিছুই দেখে লোকে...উদ্ভট কল্পনা করে...বাড়িয়ে বলে...' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল আবার, 'যাই হোক, টেড বলে গেল, রাস্তা থেকে গাছটা সরাতে সাহায্য করবে ও।'

রেগে গেল রবিন। 'কল্পনা...বাড়িয়ে বলা! আমার কি মনে হচ্ছে জানো? এই খামারেই যে সোনার মূর্তিগুলো রয়েছে, সেটা কিশোরের মতোই আরও কেউ আন্দাজ করেছে—ওই খোঁড়া গর্তগুলোই তার প্রমাণ।'

কিশোর আর মুসাও একমত হলো তার সঙ্গে।

আটকে পড়া ডেভিডের কথা ভাবল কিশোর। ও চলে এলে ভালোই হবে। ওদের সহযোগিতা করতে পারবে।

'চলো, ভূত দেখার জন্য কোথায় লুকানো যায়, আলো থাকতে থাকতেই সেটা দেখে নিই,' কিশোর বলল। 'লুকিয়ে থেকে কবরগুলোর ওপর নজর রাখব। মুসা, তুমি বাড়িটার খেয়াল রেখো।'

রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। বাকি দুজন রাতের খাবার তৈরিতে মনোযোগ দিল। সহজেই লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করে ফেলল কিশোর।

'কিশোর, দেখো!' হঠাৎ ফিসফিস করে বলল রবিন। ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুই ভাই টেড ও টেনি। চোখাচোখি হতেই তাড়াহুড়া করে নিজেদের কেবিনের দিকে চলে গেল ওরা। রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। দুজনের চোখেই সন্দেহ। বাড়ি ফিরে এল ওরা।

রাতের খাবারের সময় লুকিয়ে দেখার বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করল সবাই মিলে। ঠিক হলো, প্রয়োজনে টর্চের সাহায্যে সংকেত দেবে। দুবার জ্বালানো-নেভানো মানে: নিরাপদ। আলো জ্বেলে রাখার মানে: বিপদ।

দুই ঘণ্টা পেরোল। ঘন কালো অন্ধকার রাত নামল। এখনো ডেভিড আসেনি। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল জুলিয়া।

AMARBOI.COM
©mmhs013

এই ভুতুড়ে কাণ্ডের কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা আছে

ওদিকে, জায়গামতো এসে রবিনকে বলল কিশোর, 'চলো, আমরা বেরোই। নয়টা প্রায় বেজে গেল, আর মাত্র বিশ মিনিট বাকি।'

অস্থির ভঙ্গিতে দুই হাতের তালু ডলছে জুলিয়া। কিশোর ওর উদ্বেগ কমানোর জন্য বলল, 'ভেবো না, যেকোনো মুহূর্তে চলে আসবে ডেভিড।'

তারপর রবিনকে নিয়ে বাড়ির একপাশের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ও। পা টিপে টিপে লুকানোর জায়গাটার দিকে এগোল ওরা। দরজাটা খোলা রাখল, যদি কোনো কারণে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার দরকার হয়। দরজা দিয়ে মুসা আর জুলিয়াকে দেখতে পাচ্ছে ওরা। জায়গামতো এসে লুকিয়ে পড়ল দুজনে।

চাঁদ নেই, ভাবল কিশোর। ভূত দেখার উপযুক্ত রাত।

যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে অস্পষ্টভাবে চারটে কবর দেখতে পাচ্ছে ওরা।

অপেক্ষা করছে। প্রতিটি মুহূর্তকে অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছে। হঠাৎ, দম আটকে ফেলল কিশোর। চার জোড়া হলুদ চোখ উদয় হলো কবরের ওপর। মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল।

কুকুরের ভয়ানক গোঙানির শব্দ উপেক্ষা করে, এগিয়ে চলল কিশোর। ওই ভুতুড়ে কুকুরগুলোকে কাছ থেকে দেখতে চায়। হলুদ চোখগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারপাশ থেকে ওকে ঘিরে ফেলেছে যেন রক্ত-পানি করা শব্দ। পা পা করে এগিয়ে চলল ও। হলুদ চোখগুলোর ওপর আঠার মতো সেঁটে রয়েছে তার নজর। ওর কপাল খারাপ, পা লাগল মাটিতে পড়ে থাকা একটা মরা ডালে। হোঁচট খেয়ে চাপা চিৎকার করে উঠল। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

থেমে গেল শব্দ। কিশোরের দিকে ঘুরে গেল চার জোড়া চোখ। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে ও। নিথর হয়ে পড়ে রইল। গাছপালার ভেতরে খুঁজে বেড়াতে লাগল ওকে চার জোড়া চোখ। হঠাৎ, সোজা এগিয়ে আসতে শুরু করল ওর দিকে।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। আবার শুরু হলো সেই ভয়ংকর শব্দ। গাছপালার ভেতরে আর্তনাদ করতে লাগল ভীষণ শব্দ। ঠান্ডা ভয় চেপে ধরল ওকে। দুই জোড়া চোখ উধাও হয়ে গেল। পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। মনে হলো যেন ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়েছে কেউ।

মরিয়া হয়ে, প্রচণ্ড দুঃসাহস দেখিয়ে ডান হাতে ধরা টর্চটা উঁচু

AMARBOI.COM
©mmhs013

করতে গেল কিশোর। ভয়াল জানোয়ারগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত। কাছে এলে টর্চ দিয়েই বাড়ি মারবে। এগোতে থাকা একটা চোখ মিটমিট করে উঠল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিকে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। রহস্যময় একটা মূর্তির ওপর পড়ল আলো। আর ঠিক ওই মুহূর্তে পেছন থেকে ভারী আঘাত লাগল কিশোরের মাথায়। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল ও।

সাত

জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মুসা ও জুলিয়া। বুঝতে পারছে, ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। আচমকা উধাও হয়ে গেল কুকুরগুলোর চোখ। গাছের ফাঁকে স্থির হয়ে জ্বলে রয়েছে টর্চটা। অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে দিয়েছে ওটার রশ্মি।

'কী করব এখন?' অসহায় ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল মুসা।

কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে জুলিয়ার মুখ। অচল হয়ে গেছে যেন ও।

অবশেষে ভুতুড়ে নীরবতা ভাঙল মৃদু খসখস শব্দ। আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল দুজনে। আস্তে করে খুলে যেতে শুরু করল সামনের দরজার পাল্লা। ছিটকানিটা খোলাই ছিল। চেঁচিয়ে উঠল জুলিয়া। হাতের টর্চটা দরজা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল মুসা।

'আরে! কী হচ্ছে?' শোনা গেল একটা জোরাল বিস্মিত পুরুষ কণ্ঠ। দ্বিধান্বিত পায়ে ঘরে ঢুকল লোকটা।

'ডেভিড!' চেঁচিয়ে উঠল জুলিয়া।

ছুটে গিয়ে স্বামীর দুই বাহুর মধ্যে নেতিয়ে পড়ল ও। টর্চ ছুড়ে মারার জন্য বিড়বিড় করে ক্ষমা চাইল মুসা।

'শান্ত হও, শান্ত হও,' কোমল কণ্ঠে বলল লম্বা, সুদর্শন লোকটা। 'কী হয়েছে, খুলে বলো তে দেখি।'

গড়গড় করে সব কথা জানিয়ে দিল জুলিয়া আর মুসা মিলে। শুনতে শুনতে গভীর উদ্বেগ দেখা দিল ডেভিডের মুখে। বুঝতে পারছে, ভূত থাক বা না থাক, ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছে কিশোর আর রবিন।

'তোমরা এখানেই থাকো,' ডেভিড বলল। 'আমি ওদের খুঁজতে যাচ্ছি।' জুলিয়ার টর্চটা নিয়ে নিল ও। 'ইস্, সকালেই যদি পৌঁছাতে পারতাম, তাহলে আর এই বিপদে পড়তে হতো না তোমাদের!'

অবাক হলো জুলিয়া আর মুসা। ডেভিডের কথা বুঝতে পারল না ওরা।

'কেন, টেড কিছু জানায়নি তোমাদের?' ডেভিড জিজ্ঞেস করল। 'আমি ফোনে মেসেজ দিয়েছিলাম, বলেনি?'

ভ্রূকুটি করল জুলিয়া। 'না। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ও এসে আমাকে বলল, বিকেল পাঁচটায় ওর ভাই টেনি যখন জেনারেল স্টোর থেকে বেরিয়েছে...'

'পাঁচটা!' চেঁচিয়ে বাধা দিল ডেভিড। 'আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় একজন লোকের সঙ্গে দেখা, ও জানাল ওর নাম টেনি বিঙ্গার। আমি তখন একটা জিনিস কেনার জন্য জেনারেল স্টোরে ঢুকেছি। স্টোর থেকে যখন বেরোলাম, কয়েক বাক্স ব্যাটারি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম লোকটাকে। আমার গাড়ি স্টার্ট হচ্ছিল না। ওকে বলতেই, ও বলল, কোনো অসুবিধে নেই, খবরটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবে।'

'সকাল বেলা স্টোরেই বা গিয়েছিল কেন টেনি, আর আপনার খবরটাই বা এত দেরিতে দিতে এল কেন টেড?' মুসার প্রশ্ন।

ভুরু কুঁচকে ভাবল ডেভিড। 'বুঝতে পারছি না। আমি দুপুরেই চলে আসতাম। পারিনি, তার কারণ, গাড়ির পেট্রল ট্যাংকে ফুটো হয়ে গিয়েছিল। ফুটোটা দেখেই বুঝেছি, কোনো পাজি লোক ইচ্ছে করে ফুটো করে দিয়েছে। সেটা সারাতে বহু সময় লাগল। সারানোর পর যখন আবার রওনা হলাম, দেখি, রাস্তার মধ্যে কে একটা গাছ কেটে ফেলে রেখেছে। গাড়ি রেখে বাকি রাস্তাটা হেঁটে এলাম।'

'কিন্তু অনেকক্ষণ আগেই তো টেডকে গাছটা সরাতে বলে দিয়েছে জুলিয়া,' উত্তেজিত কণ্ঠে মুসা বলল। 'এত ব্যাটারি দিয়েই বা কী করবে ওরা?'

'টেড আর টেনিই বা তোমাকে আমাদের কাছে আসতে বাধা দিল কেন?' জুলিয়ার প্রশ্ন।

'সেটাই জানতে চাই আমি,' রাগত কণ্ঠে জবাব দিল ডেভিড। 'তারপর পুলিশকে খবর দেব। তবে কিশোর আর রবিনকে খুঁজে বের করতে হবে।'

ওরা কোনদিকে গেছে, জেনে নিয়ে ঝড়ের গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডেভিড।

চোখের পাপড়ি কেঁপে উঠল কিশোরের। চোখ মেলল। কয়েকবার চোখ খুলে বন্ধ করে নিশ্চিত হয়ে নিল সত্যিই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে কি না। মাথা ঘুরছে। কোথায় রয়েছে, মনে করার চেষ্টা করল। হাত নাড়তে গিয়ে টের পেল, দুই হাত বাঁধা। দুই পা-ও বাঁধা। মুখে কাপড় গোঁজা। শক্ত মেঝেতে, শক্ত কোনো কিছু ঘেঁষে ফেলে রাখা হয়েছে। ছত্রাকের গন্ধ পাচ্ছে ও। হাত দিয়ে না ছুঁয়েও অনুমানে বুঝতে পারল, মেঝে আর দেয়াল, দুটোই কাঠের তৈরি।

বড় একটা কাঠের আলমারিতে রয়েছে বলে মনে হলো ওর। মাথার ভেতরটা এখনো ঘোলাটে। নড়াচড়া করতে গিয়ে বাঁ পাশে কারও অস্তিত্ব টের পেল।

রবিন!

শরীর মুচড়ে রবিনের দিকে সরতে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল মাথার ঘোলাটে ভাবটা। ভয় পেয়ে গেল কিশোর। মরে গেল নাকি রবিন? মাথাটা উঁচু করে রবিনের বুকে কান রেখে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনল। মরেনি, অজ্ঞান হয়েছে।

এখান থেকে বেরোনো দরকার! ভীষণ দুশ্চিন্তা হতে লাগল কিশোরের। রবিনের আঘাত কতটা গুরুতর, বুঝতে পারছে না।

রাগত কণ্ঠ কানে এল ওর। আলমারির দরজা লক্ষ করে মাথা বাড়াল। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। টেড আর টেনির গলা চিনতে পারল। তর্ক করছে দুজনে।

'আমি এত সহজে হাল ছাড়ব না!' টেড বলল।

'কিন্তু আমাকে তো দেখে ফেলেছে ও!' বলল টেনি।

টর্চের আলোয় দেখা ভুতুড়ে ছায়ামূর্তিটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। মানুষ। আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা। দুই হাতে কালো দস্তানা। সেগুলোতে একটা করে হলুদ চোখ বসানো। ব্যাটারিতে জ্বলে ওই চোখ।

'সব নষ্ট করে দিচ্ছিল কোঁকড়াচুলো ওই বিচ্ছু ছেলেটা!' চেঁচিয়ে বলল টেড। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'সে কারণেই নাক গলানোর শাস্তি পাচ্ছে এখন।'

'ওদের কোনো ক্ষতি করা যাবে না!' টেনি বলল। 'বাবা হলেও কিন্তু এসব পছন্দ করত না—মানুষের ক্ষতি করা। বাবা শুধু মানুষকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল, যাতে নিরাপদে সোনার মূর্তিগুলো খুঁজতে পারে। কিন্তু তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। তুমি ওদের বাড়ি মেরেছ। আমি...'

'তুমি কী?' খেঁকিয়ে উঠল টেড। 'চলে যাবে? ঠিক আছে, আমরা দুজনেই যাব। তবে মূর্তিগুলো নিয়ে। আরেকটু হলেই আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। বিচ্ছু গোয়েন্দাটা ওগুলোর প্রায় কাছাকাছি চলে গিয়েছিল...তুমি এখানে থাকো! আমাদের জিনিসপত্র ট্রাংকে ভরার পর আগুন লাগিয়ে পুরো বাড়িটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেব, বিচ্ছুগুলোকেসহ।'

আগুন! শঙ্কিত হলো কিশোর। জোরে লাফানো শুরু করল হৃৎপিণ্ডটা।

টানাটানি করে বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে অবাক হলো। খুব সহজেই খুলে পড়ে গেল দড়ি। হাত মুক্ত হতেই তাড়াতাড়ি মুখে গোঁজা কাপড় টান দিয়ে খুলে ফেলে, পায়ের দড়ি খুলল। তারপর হাত বাড়াল রবিনের দিকে। ওর দড়িও ঢিল করে বাঁধা। বিস্ময় বাড়ল কিশোরের। চোখের পলকে আলমারির পলকা কাঠের দরজা ভেঙে বেরিয়ে এল ও।

দুই ভাইয়ের কেউই নেই তখন ঘরে। কাঠের মেঝের এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। খুব ধীরে ছড়াচ্ছে। কোনো কারণে আগুনটা ভালোমতো ধরতে পারছে না। একটা বালিশ দেখে সেটা দিয়ে বাড়ি মেরে সহজেই নিভিয়ে ফেলল কিশোর। নাকেমুখে ধোঁয়া ঢুকতে কাশতে শুরু করল। আগুনের আলোয় একটা হারিকেন দেখেছিল। সেটা জ্বালল। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে গেল দুই ঠোঁটের ফাঁক থেকে।

অবাক হলো কিশোর। আসবাবপত্র সব ভেজা। কেরোসিন কিংবা পেট্রলে ভেজানো হলে এতক্ষণে কখন ধরে যেত। পরীক্ষা করে বুঝল, কেরোসিনের বদলে পানি দিয়ে ভেজানো হয়েছে।

AMARBOI.COM

©mmhs013

এখান থেকে বেরোনো দরকার

নিশ্চয় টেনিই এ কাজ করেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। ওদের পুড়িয়ে মারার বিষয়টা মেনে নিতে পারেনি লোকটা।

ঠিক ওই মুহূর্তে, লম্বা একজন ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মানুষ ছুটে ঘরে ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কিশোর!'

'ডেভিড!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'যাক, তোমরা ভালোই আছো!' ডেভিড বলল।

আট

এখানে কীভাবে এসেছে, দ্রুত জানাল কিশোর। ডেভিডও জানাল, সে কীভাবে এসেছে। ফোনে পুলিশকে খবর দিতে দেরি করল না ডেভিড। এখনো আলমারির ভেতর রয়েছে রবিন। দুজনে মিলে টেনে বের করল ওকে। একটা সোফায় শুইয়ে দিয়ে তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। যখন নিশ্চিত হলো, রবিন শঙ্কামুক্ত, তাড়াহুড়া করে তখন বাড়ি রওনা হলো কিশোর।

ভোরের আলো ফুটছে তখন। বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত নীরব। ব্যাপারটা ভালো লাগল না কিশোরের। কিছু কি ঘটল? দৌড় দিল ও। আর ঠিক এই সময় সামনের দরজা দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে পা টেনে টেনে বেরিয়ে এল দুই ভাই টেড ও টেনি। টেডের এক হাতে একটা কুড়াল, আরেক হাতে একটা খাতা।

'আমি তোমাকে এ কাজ করতে দেব না!' চেঁচিয়ে বলল টেনি। ভাইয়ের পথ আগলাল।

কিশোরের ওপর চোখ পড়ল টেডের। বুঝল, ফাঁদে পড়ে গেছে। ভাইকে জোরে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, দৌড়ে গিয়ে ওর পিকআপ গাড়িটাতে উঠে, চালিয়ে নিয়ে চলে গেল।

দূরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনে কিশোর বলল, 'বেশিদূর যেতে পারবে না ও।'

'জানি,' বিড়বিড় করল টেনি। 'ও আমাকে গাছটা সরাতে বলেছিল, কিন্তু আমি সরাইনি। ওটা না সরিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না টেড।'

টেনির দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। হতবিহ্বল, টলতে থাকা লোকটাকে ধরে ঘরে নিয়ে এল। ভয়ে এককোণে জড়সড় হয়ে ছিল জুলিয়া আর মুসা। কিশোরদের দেখে ছুটে এল। সবাইকে নিয়ে চেয়ারে বসল কিশোর। পুরো ঘটনাটা বিস্তারিত খুলে বলল।

AMARBOI.COM
©mmhs013

'তার মানে,' সব শুনে জুলিয়া বলল, 'কিশোরের কথাই ঠিক—ওরা বাপবেটা সবাই মিলে ভূতের ভয় দেখিয়ে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে!'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'মূর্তিগুলো খুঁজতে ওদের সুবিধে হবে ভেবে। তবে এসব ব্যাপারে টেনির খুব একটা ইচ্ছে ছিল না।' লোকটার দিকে তাকাল ও। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে টেনিকে।

বাইরে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হলো। দুজন পুলিশ অফিসার টেডকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। রাগে লাল হয়ে গেছে টেডের মুখ।

'রাস্তা থেকে ওকে ধরেছি,' একজন অফিসার বললেন, 'পড়ে থাকা একটা গাছ সরানোর চেষ্টা করছিল।'

'আমি তোমাকে ওই গাছটা সরাতে বলেছিলাম!' ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল টেড। কিশোরের দিকে চোখ পড়তেই ঘুসি পাকিয়ে ওর দিকে ছুটে আসতে চাইল, অফিসাররা ধরে ফেললেন ওকে।

'সব বলছি আমি,' আচমকা বলে উঠল টেনি, 'আমার আব্বা জানত সোনার মূর্তিগুলো উইন্ডি ওকেই লুকানো হয়েছে। জর্জ এডিনবার্গ আর তাঁর স্ত্রী মারা গেলে ওগুলো বের করে নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেল আব্বা। বাদ সাধল কুকুরগুলো। কিছুতেই বাড়িতে ঢুকতে দেয় না। তাই বিষ খাইয়ে মারল ওগুলোকে। প্রচার করে দিল, প্রভুর শোকে না খেয়ে মরে গেছে ওগুলো। জর্জ এডিনবার্গের ইচ্ছে অনুযায়ী কুকুরগুলোকে পাহাড়ের ওপর কবর দেওয়ার কথা। কিন্তু টেড সেটা করতে দিল না আব্বাকে। ইচ্ছে করেই কুকুরগুলোকে আইস হাউসের পেছনে কবর দিল। প্রচার করে দিল, ভুল জায়গায় কবর দেওয়াতে ওগুলো ভূত হয়ে গেছে। দস্তানায় ব্যাটারি-চালিত চোখ লাগিয়ে রাতে মানুষকে দেখানোর বুদ্ধিটা টেনিই বের করেছিল। গাছের ডালে স্পিকার লুকিয়ে রেখে, টেপ করা কুকুরের গর্জন শোনানোর বুদ্ধিটাও তারই।'

'আর নখের আঁচড়ের দাগ?' কিশোর জানতে চাইল।

'ইস্পাত দিয়ে বানানো নকল নখ,' টেনি বলল। 'তোমাদের আসার কথা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল টেড। রাস্তায় গাছ ফেলে ঠেকাতে চেয়েছিল। ডেভিড সাহেবকে থামাতে, আর তাজা ব্যাটারি কিনে আনতে আমাকে স্টোরে পাঠিয়েছিল। জানালার কাছে আড়ি পেতে আমরা তোমাদের কথা শুনতাম। কিশোর শখের গোয়েন্দা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাই ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল গর্তের মধ্যে। ওর এসব কাজ প্রথম থেকেই আমার ভালো লাগেনি। একে তো অন্যের জিনিস চুরি করারও ইচ্ছে ছিল না আমার। তারপর যখন খুনখারাপির চিন্তা শুরু করল ও, ঠিক করলাম, আমি আর এর মধ্যে নেই। ওই গাছ সরাতে বললেও সরালাম না, ব্যাটারি এনেও লুকিয়ে ফেললাম। ওর কথামতো আর চললাম না।'

'কেবিন থেকে আমাদের বেরোতেও সাহায্য করেছেন আপনি,' কিশোর বলল। দড়ির বাঁধন ঢিল করে রেখে কীভাবে সাহায্য করেছে, সেটা পুলিশকে জানাল ও।

চেঁচিয়ে ভাইকে গালি দিতে লাগল টেড।

দুজনকেই নিয়ে গেল পুলিশ। কিশোরের কাছে টেনির ভালো ব্যবহারের কথা শুনে এক অফিসার বললেন, যা যা ঘটেছে সব তাঁরা আদালতকে জানাবেন। তাতে টেনির অপরাধটা হয়তো হালকাভাবে দেখবেন আদালত।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে চওড়া হাসি হাসল জুলিয়া। 'সত্যিই তাহলে এই বাড়িটাতে বাস করতে পারব আমরা! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'কিন্তু আরেকটা বড় রহস্য থেকেই গেল,' রবিন বলল, 'সোনার মূর্তিগুলো। বের করা গেল না সেগুলো।'

মিটিমিটি হাসি দেখা গেল কিশোরের চোখে। 'ওগুলো কোথায় আছে, বোধহয় বুঝতে পারছি আমি। আড়ি পেতে আমার কথা শুনে টেডও বুঝে গিয়েছিল, টেনি বাধা দেওয়াতেই বের করে নিয়ে যেতে পারেনি।'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সবাই, ডেভিডসহ। একটা কাগজে কুকুরের নামগুলো লিখে বাড়িয়ে ধরল ও। 'অক্ষরগুলোকে উল্টো দিক থেকে সাজালে কী কী শব্দ হয়, বলো তো?'

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইঙুক, ঐঙজঝউ, ঈঅঘঅওঘউ, অেজউউঘ।'

'বুক, হর্স, গার্ডেন-এর মানে তো পরিষ্কার। ক্যানাইন দিয়ে কুকুর বোঝানো হয়েছে। বলো তো, এসব শব্দ কোথায় লেখা আছে...' কিশোর বলল। ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল জুলিয়া, 'লাইব্রেরিতে!'

'হ্যাঁ, লাইব্রেরিতে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বুক শব্দটা দিয়ে সেটাই বোঝানো হয়েছে। লাইব্রেরিতে যে তিনটে তাকে তিনটে শব্দ লেখা রয়েছে, আমি শিওর, ওগুলোর পেছনেই রয়েছে ওই সোনার মূর্তিগুলো।'

'কিশোর, তুমি সত্যিই একটা জিনিয়াস!' জুলিয়া বলল।

লাফিয়ে উঠে লাইব্রেরিতে ছুটল সবাই। হর্স, ক্যানাইন আর গার্ডেন লেখা তিনটে তাকের বই সরিয়ে তাকগুলো খুলে আনতেই পেছনে ছোট একটা গোপন দরজা দেখা গেল। ওটাতে চাপ দিল কিশোর। হলো না কিছু। ভালোমতো খুঁজতেই ছোট্ট একটা বোতাম দেখা গেল দরজাটার পাশে। দেয়ালের রঙের সঙ্গে মিশে রয়েছে। সেটাতে চাপ দিতেই গোপন স্প্রিং ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটাকে। দেয়ালের গায়ে তৈরি করা একটা ছোট্ট কুঠুরির তাকে সাজানো রয়েছে সোনার তৈরি চারটে কুকুরের মূর্তি।

বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ সুন্দর জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। তারপর একটা মূর্তি তুলে আনল জুলিয়া। অনেক ভারী। সবাই মিলে হাতে হাতে চারটে মূর্তি নিয়ে বসার ঘরে ফিরে এল ওরা।

জুলিয়ার চোখে পানি টলমল করছে। আবেগ ধরে রাখতে পারছে না। হাত চেপে ধরল কিশোরের।

'থ্যাংক ইউ, কিশোর,' ফিসফিস করে বলল ও। তারপর বলল, 'তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য করেছ বলে।'

'আমি কী বলব, বুঝতে পারছি না,' আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছে ডেভিডও।

'আবার কবে এই খামারবাড়িতে আসব, সেটা বলো,' হাসিমুখে মুসা বলল। 'এত সুন্দর একটা জায়গায় বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে...পরেরবার আসব গাছের কানাকানি আর পাখির গান শুনতে, ভুতুড়ে কুকুরের গর্জন নয়।'

ওর বলার ভঙ্গিতে হাসি ফুটল সবার মুখেই। ◆

fb.com/imran2592